সুন্দরবন আন্দোলনের গান-৪

সংকলন ও ভূমিকা : বীথি ঘোষ

একটা বনভূমি রক্ষার আন্দোলন কেমন করে অসংখ্য মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করাতে পারে সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলন সেই অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হাজির করেছে। সুন্দরবনের অস্তিত্বের সঙ্গে কেবল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিষয় জড়িয়ে নেই, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও। তারই প্রকাশ হিসেবে প্রতিবাদের আর ভালোবাসার প্রকাশে অগণিত গান, নাটক, কবিতার জন্ম হয়েছে। সেসব সৃষ্টি থেকে গানের সংকলন করতেই এই ধারাবাহিক প্রকাশনা। এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতব্য সংকলনের চতুর্থ পর্ব। নাটকের দল বটতলা'র একটি পালা এইবার যুক্ত হলো। সুরে-ছন্দে-অভিনয়ে তারা সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

নাটকের দল বটতলা'র পালা–

মধু শিকারি

রচনা : কার্তিক নায়ার
অনুবাদ : শামীম আজাদ
ডিজাইন ও নির্দেশনা : মোহাম্মাদ আলী হায়দার

লওরে আল্লার নাম, লওরে আল্লার নাম
এই যে হরদমে হরদমে লওরে আল্লা নবীর নাম
আল্লা আমিন বল ভাইরে ও মমিনা ভাই
আল্লা ছাড়া এই জগতে মাবুদ কেহ নাই
বাংলাদেশের দক্ষিণ ধারে রে... আছেরে
একটা সুন্দর ফরেস্ট
বসত করে শনু মিয়া, জানাইলাম আসরে
মধু পাগলা শনু মিয়া কিবা কাম করে
কীট-পতঙ্গের সাথে সে যে বিবাদ বড় করে
তারপরে কিবা হইল গো ভাইরে
শুনতে যদি চান
সেই গল্প কইব আমার বন্ধু গোলাপজান
গোলাপজান-আঠারো জোয়ার ভাটার দেশের ও কাহিনী
তিনটা নদী আছে সেখানে গো ভাইরে
পদ্মা মেঘনা যমুনা...না
হায় গো আমার বিষয় না বুঝিয়া-জীবনে কি করলাম আমি গো

তিনটা নদীর মিলন হইছে বঙ্গোপসাগরে
সেইখান থেকে জন্ম নিছে গো ভাইরে
ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট-
হায় গো আমার বিষয় না বুঝিয়া-জীবনে কি করলাম আমি গো

ম্যাঙ্গোফরেস আবার কী?
এটা এমন এক বন যেখানে গাছের পাগুলি থাকে উপরে আর মাথাগুলি থাকে নিচের দিকে। মাথা যখন পানির নিচে ডুবে যায় তখন তার পাগুলি উপরে বাতাসে নাচতে থাকে। গাছের শিকড় মাটির নিচে ঢোকার বদলে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কেবল ওপরে উজাতে থাকে– ।
হায় গো আমার বিষয় না বুঝিয়া-জীবনে কি করলাম আমি গো

তিনটা নদীর মিলন হইছে বঙ্গোপসাগরে
সেইখান থেকে জন্ম নিছে গো ভাইরে
ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট
হায় গো আমার বিষয় না বুঝিয়া-জীবনে কি করলাম আমি গো

যখন জোয়ার জাগে, সেই আঠারো জোয়ারের পানি হু হু করে আসতে থাকে তখন গাছের কাণ্ড শিকড়-বাকড় শাখারা সবাই সড়বান সেরে নেবার জন্য সেই পানিতে ঝুপ করে ঝাঁপ দেয়। আবার ভাটার সময় যখন তারা সবাই ভেসে ওঠে তখন তাদের পাতাদের মনে হয় যেন পানড়বা পাথর দিয়ে তৈরি, আর ফুলেদের দেখতে উজ্জ্বল ঝকঝকে আর সতেজ লাগে। সেই ম্যানগ্রোভ জঙ্গল বা বনটি ছিল বঙ্গোপসাগরের গা ঘেঁষে [পৃথিবীর] সব বনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছিল বলে লোকে তাকে সুন্দরবন নাম দিয়েছিল, সেই বনে বাস করতো হাজার হাজার লাখ লাখ কিংবা কোটি কোটি মৌমাছি।

এই যে হাজার হাজার বা কোটি কোটি মৌমাছি তাদের সবাইকে কিন্তু শাসন করে একজন। আর সে হচ্ছে সব মৌচাকের রানী মৌমাছিদের রানী, দেবী মৌমাছি। তার চোখগুলো বড় কালো আর বিষন্ন, ডানাজোড়া সোনালি। সে যখন উড়ে উড়ে যেতো তা হতো যেন গাছের গায়ে আছড়ে পড়া হাওয়ার মতো, উপচে ওঠা ঢেউয়ের মতো, পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণায়মান চাঁদের মতো– সব একসাথে দুলতে থাকতো। সে ধন্য, ধন্য তার মৌমাছিরা। ফুল ফোটে, ফল পাকে। তাদের ধন্যবাদ। পৃথিবীতে জীবন বয়ে চলে।

মৌমাছিরা দিনের বেলা ফুল থেকে ফুলে উড়ে উড়ে পরাগ থেকে মধু তুলে আনে; মৌচাক বানায় আর তার খোপগুলো ভরে ফেলে ঘন সোনালি মধুতে– অনেকে সেই মধুকে বলতো তরল আলো, যে আলোকে আনন্দের আজলা ভরে পান করা যায়।

একবার ভাবো সেই মধুর কথা। গাছের গা থেকে গড়িয়ে পড়ছে যেন সূর্যের মিষ্টি ফোঁটা, গড়াতে গড়াতে তা এসে পড়ছে বনের উঠানে। বনের সব পশুপাখি সবাই সে মধুর জন্য মাতোয়ারা। একখণ্ড নীলাকাশের মত উড়ে যাওয়া নীল কানের মাছরাঙারা। এক গাছ থেকে আরেক গাছ ডিঙানো সুপার হিরোর মতো বড় বড় বাদুড়েরা। ডাইনোসরের বংশধর হলেও হতে পারে সেই বড় বড় গিরগিটিরা। সোনাবরণ হরিণ। ছোট্ট কালো পিঁপড়া। কাঁটাওয়ালা সজারু। বুনোশুয়োর। সবাই।

ওরা গাছ বেয়ে উঠতো বা বাতাস থেকে সাঁই করে নেমে আসতো বা বনের ভেতরে পাল্লা দিয়ে

ছুটে যেতো সেইখানে– যেখানে টপ টপ টপ করে মধু গড়িয়ে পড়ে ভেসে যাচ্ছে। তাতেইতো মধু খাওয়া চিত্রল হরিণ বা বাঁদরের গায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়ে আনন্দে গান গাইতো কুমির। তাইতো বনের মাটি নিজেই ঝরে পড়া মধুকে ভালোবেসে তাকে তার বুকে জড়িয়ে রাখতো।

তারপরে কিবা হইল গো ভাইরে– শুনতে যদি চান
সেই গল্প কইব আমার বন্ধু আলেকচান

সেইখানেই বাস করতেন, ঐ-তিনি-যিনি-যার নাম-মুখে নেয়া বারণ, তিনি মধু এতই ভালোবাসতেন যে সবই তার করায়ত্ব রাখতে চাইতেন। বিশেষ করে মধু সংগ্রাহকরাই ছিল তার চোখের বিষ...

এই ঐ-তিনি-যিনি-যার নাম-মুখে নেয়া বারণ, তার মানে কী?
সসসসসসস চুপ। যদি আমি তাঁর নাম বলি– চোখের পলকে তিনি হাজির হয়ে যাবেন। তাই আমরা তাঁর নাম নিই না।
কিন্তু কে তিনি?
আহ হা তিনি আরকি। দক্ষিণের সম্রাট। বনের রক্ষাকর্তা। দানবের রাজা। তাঁর নাম মুখে নিলেই তিনি হাজির হবেন। তারপর না- কারো মানে একেবারেই কারো সাধ্য নেই তোমাকে তার হাত থেকে বাঁচানোর। কিন্তু একজন ছিল যে কিনা তাঁকে যতোটা না ভয় পেতো তার চেয়েও বেশি মধুকে ভালোবাসতো।
আমি?
আরে নাহ্। সে ছিল শনু নামের ছোট্ট একটি ছেলে। তোমার মতোই বয়স কিন্তু দেখতে তোমার চেয়ে আরেকটু খাটো আর চুলগুলো ছিল খাড়া খাড়া আর তার গলায় ছিল কালো সুতোয় বাঁধা একটি মাদুলি। এই মাদুলিটি তাকে বনের চিতাবাঘ, বুনোশূকর, খ্যাপা জোয়ার আর নাম না জানা অনেক অনেক ভয়ানক জিনিস থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদে রাখে।

শনু একটি চরে বাস করতো। জানো, এই চরটি ঐ সেই তিন নদী তাদের দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা পথে নানান জায়গা থেকে যেসব জিনিস তুলে এনেছিল তা দিয়ে বানানো। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জোয়ার-ভাটায় ও বর্ষায় এ চরগুলো জেগে উঠতো, নয়তো ডুবে যেতো এবং প্রতিবার চর ডুবে গেলে যারা সেখানে বাস করতো তাদের এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হতো। শনুদেরও তাই করতে হতো।

সে কি একা থাকতো? মৌগলির মতো?
না, সে থাকতো তার আম্মা ও আব্বার সঙ্গে। তার আম্মা ছিলেন চিংড়ি চাষী আর আব্বা ছিলেন মধু সংগ্রহকারী মৌওয়ালি। গ্রীষ্মকালে ওর বাবা জঙ্গল থেকে মধু ও মৌচাকের মোম সংগ্রহ করতেন। এই গ্রীষ্মকালেই, মৌ মাছিরা তাদের বাড়ি বানানো শেষ করে, তাদের ছেলেপুলেগুলোকে বড় করে তুলে, ফুলের পরাগ এক ফুল থেকে অন্য ফুলে ছড়িয়ে দিতো। তারপর সবকিছু নিশ্চিত হলে দেবী মৌমাছি মানুষকে মধু নিতে দিতো।

ছোট্ট শনু সবচে' বেশি মধু খেতে পছন্দ করতো। পারলে সে তার সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার এমনকি রাতের খাবার হিসাবেও মধু খেতো। কিন্তু ওর পরিবার এতো গরিব ছিল যে প্রতিদিন তিনবেলা খাবার যোগাড় করাই কষ্ট ছিল। তাই এমন কি মধুমাসেও তার বাবা যেটুকু মধু সংগ্রহ করতেন তা নিজেরদের জন্য রাখতে পারতেন না; সেই মধু বিক্রি করে তাদের চাল ও শাক-সবজি কিনতে হতো। কিন্তু আব্বা যেহেতু শনুকে অনেক ভালোবাসতেন, তিনি যে হাতাটা দিয়ে বিক্রির করার জন্য বিভিন্ন পাত্রে মধু ঢালতেন সেই হাতাটাই শনুকে দিয়ে দিতেন। শনু সেই হাতাটা চেটে চেটে খেতো আর আব্বাও হাতটাতে যতদূর পারা যায় মধু রেখে দিতেন।

আর যখন আব্বার এই মধু বা মোম যোগাড় করতে হতো না তিনি তখন বাসায় থেকে শনুকে পড়া ও গণনা শেখানো (তাদের দ্বীপে কোনো স্কুল ছিল না) নয়তো ঘরের ছাদ মেরামত করা– এরকম কাজ করতেন। আম্মা চিংড়ি মাছের ঘের দিতেন। তাদের কোন মতে চলে যেত। তাদের জীবন ছিল জোড়াতালির, ঠিক তাদের কুঁড়ে ঘরের ছাদের মতো। তবু শনু সুখি ছিল। সে নদীতে ভোঁদড় তাড়িয়ে বেড়াতো, মাকে চিংড়ি বাজারে বয়ে নিতে সাহায্য করতো। বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতার কাটতো। সে তাদের লম্বা পদ্ম পাপড়ির মত নৌকোটাকে ধোয়া-মোছায় তার বাবাকে সাহায্য করতো। এই নৌকাটা নিয়ে তার বাবা আর চাচারা মধু আহরণে যেতো।
তারপর একবছর সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।
ছয় ঋতুর সবগুলো উলট-পালট হয়ে গেল।

একটার পর একটা আসে ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো... কিন্তু সে বছর তারা নিয়ম ভেঙে আসতে লাগলো যেন বিভ্রান্ত ও রাগান্বিত। যেনো কেউ তাদের স্কুল ক্যালেন্ডার তছনছ করে গেছে।

তারপরে কিবা হইল গো ভাইরে- শুনতে যদি চান
সেই গল্প কইব আমার বন্ধু মালেকচান

জানুয়ারিতে শান্ত শীতল বসন্তের বদলে, কোনোরকম সতর্ক না করে দুঃস্বপ্নের মত এক ঘূর্ণিঝড় উপকূল দিয়ে বয়ে গেল। তার ক্ষুব্ধ আঘাত বাড়িঘর নৌকো আর ঘাট সব চুরমার করলো। গবাদিপশু, মানুষ ও হাঁস-মুরগিদের ও মাছেদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। আর রোগ, মৃত্যু ও ক্ষুধা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সেই ঘূর্ণিঝড় ডজন ডজন চর ডুবিয়ে দিল আর বহু দূরে নতুন চর জাগাল। সেই ঘূর্ণিঝড় বন তছনছ করে, বনের গাছ সমূলে উপড়ে ফেলে, পশুদের ডুবিয়ে মেরে সবকিছু একাকার করে দিলো।

প্রহরে প্রহরে আসতে লাগলো জোয়ার আর জোয়ার– সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে নোনা করে দিতে লাগলো, এমন হল যে কোনো কোনো দিন মিঠা পানি পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়লো। দ্বীপের মধ্যে আম্মার ও আর যাদের চিংড়ি ঘের ছিল, সবই সাগরের পানিতে ভেসে গেল। নদীর মাছগুলো অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো। সেবার শানুদের দুমাসের মধ্যে তিনবার জায়গা পাল্টাতে হলো। তারা যেখানে আস্তানা গাড়ে সেখানে জোয়ারের পানি বাড়তে থাকলে তাদেরকে নৌকা বেয়ে অন্য চরে অন্য জায়গায় উঠে যেতে হয়। তারা যে বাড়ি বানায় তাই আবার ভাঙে, নিজের বলতে যা কিছু আছে সেসব তারা একবার বিছায় আবার গুটায়, যত্ন করে যে চিংড়ি জন্মায় আবার আর তা হারায়।

বার বার বার বার, এভাবেই বার বার

জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির কাছে হার মানলো; বসন্ত সবার অলক্ষে চলে গেল। আর পা টিপে টিপে মার্চে আসার বদলে তার আগেই এক মহারাগী, শুকনো খটখটে ও অত্যন্ত উষ্ণ গ্রীষ্ম এসে গেল। তাতে তাদের নতুন কুঁড়েঘরের পেছনের ছোট সবজিক্ষেতের গাছপালা ধুলোয় ঢেকে গেল। গনগনে লাল সূর্য তার তাপে তাদের সব গাছপালা ঝলসে দিলো। একের পর এক তারা বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগলো, কোন কিছু আর সবুজ থাকলো না, সবই বাদামি ও ধূসর হয়ে গেল।

এরকম দিনে শনু চোখ বন্ধ করে একমনে মধুর কথা ভাবতো। এমন ভাব করতো যেন তার মুখের ভেতর পানি যেন এক চামচ ভরা মধু। রুটির সঙ্গে মধু, দুধ-ভাতের সঙ্গে মধু– ক্ষিরের মতো। ইলিশ মাছে মধু– ইয়াম ইয়াম, যা মজা! গোলপাতার চামচে বয়াম থেকে তুলে আনা মধু– যেমন তোমরা জ্যাম তুলে খাও সেরকম আরকি! কিন্তু হায়, স্বপ্ন সুস্বাদু হলেও তা শনুর অভুক্ত শূন্য পেট ভরাতে পারে না।

তারপরে কিবা হইল গো ভাইরে– শুনতে যদি চান
সেই গল্প কইব আমার বন্ধু পাগলচান

তাহলে তারা নৌকা করে বনে গিয়ে মধু নিয়ে আসে না কেন?

ঠিক এই কথাটিই শনু প্রতিদিন তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু তার বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, না শনু, এখনো সময় হয়নি। এ বছর এতো আগে গরম পড়ে যাওয়ায় মৌমাছিরা এখনও তাদের চাক তৈরি করে উঠতে পারেনি। এ সময় তারা এখন নতুন রানী মৌমাছির জন্য চাক মেরামত করছে। এখন ওদের বাধা দেওয়া একদম ঠিক হবে না। ওরা যতক্ষণ না মধু দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। একদিন আম্মাও বুঝিয়ে বলেন, তোমার বাবা ঠিক বলেছেন। এখন যদি আমরা মধু নিই তাহলে বনবিবি আর ঐ-তিনি-যিনি-যার নাম মুখে নেয়া বারণ, তাদের ভেতর চুক্তি ভেঙে পড়বে। তখন বনে বা গ্রামে শান্তি থাকবে না, নিরাপত্তা থাকবে না। সবাই বলে কাঠুরেরা গতবছর অনেক বেশি গাছ কেটে ফেলেছে। সে জন্যই ঘূর্ণিঝড় নাকি এতো প্রবল হয়েছিল। ঐ-তিনি-যিনি-যার নাম মুখে নেয়া বারণ তিনি নাকি ভীষণ রেগে আছেন।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, এই বনবিবিটা যেন কে?

ও হ্যাঁ! ততোদিনে শনু জানে বনবিবি কে ছিলেন- সবাই জানে! তিনি ফকির ইবরাহিমের মেয়ে, শাহ জঙ্গলির বড়বোন। বনবিবি সুন্দরবন ত্রাণকারী দেবী, আমাদের রক্ষাকারী দেবী। তিনি বহুদিন আগে বহুদূর থেকে সেই মদিনা থেকে এসেছেন। তিনি এসেছিলেন দক্ষিণের সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, তার সঙ্গী ভূত-প্রেতসহ তাকে, দৈত্য রাজাকে ধুলায় মিলিয়ে দিতে। আর তিনি তা করতেও পেরেছিলেন। একটানা কয়েক দিন-রাত্রি ধরে এক তুমুল রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর বনবিবি দক্ষিণ রায়কে পরাজিত করলেন।

সর্বনাশ! তুমি তার নাম নিলে, ঐ-তিনি-যিনি-যার নাম মুখে নেয়া বারণ!
হুম, ভাবছি এখন এই ব্যাপারটা একটা ভয়ঙ্কর ত্রাসের ব্যাপার হয়ে গেল! শুধু ঐ শেষের শব্দগুলোই মারাত্মক। কিন্তু শোনো এদিকে আমি এক নিঃশ্বাসেই বনবিবির নামটাও নিয়ে ফেলেছি। ভাগ্যিস তাতেই রক্ষা! আমরা নিরাপদ।

কিন্তু, বনবিবি যদি তাঁকে মেরে ফেলে থাকেন তাহলে...
আরে না তিনি তাঁকে মেরে ফেলেননি, আমি তাই বলেছি নাকি? না না না, বনবিবি এটা ঠিকই বুঝেছিলেন যে, দক্ষিণ রায় এই বনকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাঁর জঙ্গল দখল করে, বন কেটে, মধু লুটপাট করে যারা সব নিঃশেষ করে দিচ্ছে তিনি তাদের কারণেই ক্ষিপ্ত, এটাই তাঁর প্রতিশোধ পরায়ণতার একমাত্র কারণ। তাই বনবিবি তার মাথা না কেটে না মেরে তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, কেউ এই বনের প্রাণী ও বনের জীবজন্তুদের কোনো ক্ষতি না করলে তাদের কোন ক্ষতি করা যাবে না।

ঠিক শনুর আব্বা-আম্মার মতো?
একদম তাই। কিন্তু এখন সেখানে অনেক লোভী ও খারাপ মানুষ আছে যারা একদম শনুর আব্বা-আম্মার মত নয়। আর এরাই সুন্দরবনের গাছ কেটে মধু লুট করে বনের পশুদের মেরে সাফ করে দিচ্ছে। আর তাই দক্ষিণ রায় (বনবিবি! রক্ষা করো) রেগে আছেন, মহা ক্ষেপে আছেন এখন।

কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে শনু এত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল যে তার আব্বা-আম্মার করা সকল সতর্কবাণী তার মাথা থেকে মুছে গেল। আর এদিকে এই অদ্ভুত গ্রীষ্মকাল আরো কিছুদিন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে এক একটা দিনকে মনে হচ্ছিল যেন এক সপ্তাহের সমান। আর রাত? সেটা যেন শেষই হচ্ছিল না। তার কষ্ট কেবল বাড়ছিল আর বাড়ছিল।

আর কিছুদিনের মধ্যে শনুর মাথায় কেবল এক চিন্তাই ঘুরতে লাগলো, মধু মধু মধু মধু আর মধু।

মজার মধুরে-আমি খাইতে নাইত পারি পরান ভইরা
চাকের মধু চাকের থাকল-পাইলাম না তাহারে-আমি পাইলাম না তাহারে
মজার মধুরে–আমি খাইতে নাইত পারি পরান ভইরা
গাছে থাইকা আছে যে মধু–তুমি কতদূর
আমার মন খাইতে চায় যে শুধু–দিবানিশি মধু
মজার মধুরে–আমি খাইতে নাইত পারি পরান ভইরা

এই শব্দটি তার মাথার ভেতরে বাড়ি মারতে লাগলো জোয়ারের সময় ঢেউ যেভাবে তীরে আছড়ে পড়ে সেভাবে।

তারপরে একদিন সকালবেলা কী হলো জানো, তার পেট থেকে এই মধুক্ষুধা ছড়িয়ে পড়লো তার বুকে, বুক থেকে গলায়, পায়ে, মাথায় এবং প্রাণের ওপর তা তা হাজার হাজার লাল পিঁপড়ার মতো হামা দিয়ে দিয়ে এমনভাবে ছেয়ে যেতে লাগলো যে শনুর আর সহ্য হলো না।

কানে এল কোটি কোটি মৌমাছির গুঞ্জন যারা মধু আহরণে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

শনু সেই শব্দ লক্ষ্য করে একটু একটু করে খুব সতর্কতার সঙ্গে এক হাতে গলার মাদুলি ছুঁয়ে থেকে এগুতে লাগলো। সে এমনভাবে পা ফেলছিল যেন ভুলেও মরা গাছের মতো দেখতে কোনো ঘুমন্ত কুমিরের গায়ের ওপর পা না দেয়! গুঞ্জন বাড়তে বাড়তে এক সময় তা হয়ে উঠলো সিম্ফনি, কাঠের বাজনা, পিতলের বাজনা, তারের বাজনা বেজে বেজে ভিন্ন ভিন্ন সুরধ্বনিতে গাঁথা মালায় অর্কেস্ট্রা হয়ে সম্পূর্ণ হলো। শনু মৌচাকরাজ্যে পা দিলো। কালো ও সোনালি মেঘের আকারে পাহাড়, দুর্গ, মুকুট, গোলাপ, চূড়া সবই মাথা উলটে বাঁকা হয়ে পা উপরে তুলে আছে। গাছের উপর থেকে ঝুলছে, টিলার উপর থেকে গজাচ্ছে অথবা কোন শূন্য থেকে কে জানে।

কোটি কোটি মৌমাছিদের প্রতিটি গুঞ্জনে সৃজনে সৃজনে তারা আরো জড়ো হওয়ায় এতো মশগুল যে জানলোই না যে একটি ছোট্ট ছেলে কীভাবে লোভাতুর হয়ে উঠছে। তার চোখ বড় থেকে আরো বড় ও উজ্জ্বল হতে হতে এক সময় তা ক্ষুদ্রাকৃতি সূর্য আর মুখের হাঁ বড় হয়ে হাঁটুতে গিয়ে ঠেকলো। শনু তার বাবার সতর্কবাণী, মধু নিয়ে মায়ের মুখে শোনা গল্প সব ভুলে গেল। সে রীতিমত মৌচাকের ওপর হামলে পড়লো, কাজে ব্যস্ত মৌমাছিদের একেবার নড়িয়ে চড়িয়ে ছারখার করে। তারপর প্রথমেই কাছে যে গাছ ছিল সেটা বেয়ে উঠে এক দলা চাক ভেঙে মুখের উপর চিপে চিপে সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটায় গড়িয়ে পড়া মধু খেতে থাকলো।
সে নিজেকে মৌচাকের মধ্যে সেঁধিয়ে দিল, তাতে কিছুটা চাক ভেঙে

টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর কর্মী মৌমাছিরা হতভম্ব হয়ে গেল। সে আবার দৌড়ে গিয়ে কাছের আর একটা গাছে গিয়ে তাতে চড়লো আর মৌচাকের একটা দলা চাক ভেঙে নিঙড়িয়ে চুঁইয়ে পড়া মধু পান করতে থাকলো। মৌমাছিরা গেল ক্ষেপে, তারা রাগে আর ভয়ে জোরে জোরে গুঞ্জন করতে লাগলো। তারা দল বেঁধে বেরিয়ে এসে তাকে হুল ফোঁটাতে লাগলো যতক্ষণ না সে বিষে নীল হয়ে যায়।

লড়াই বাধিল রে-মানবে পতঙ্গে লড়াই বাধিল রে
ছোট্ট শনু অসময়ে মধু খাইতে চায়রে– মৌমাছিরা মধু দিতে এখন তো না পারে

লড়াই বাধিল রে-মানবে পতঙ্গে লড়াই বাধিল রে
মধু খাইতে ছোট্ট শনু হাত বাড়াইল চাকে-মৌমাছিরা মিলে সবাই ঘিরে ধরল তাকে
লড়াই বাধিল রে-মানবে পতঙ্গে লড়াই বাধিল রে

মৌমাছিদের চেষ্টার শেষ ছিল না, কিন্তু তাদের হুল শনুকে ছুঁতেই পারছিল না। তার গলার সেই যাদু-মাদুলি তাকে বাঁচিয়ে রাখলো। এ মাদুলি তাকে শুধু চিতা, বন্যশূকর আর ক্ষুব্ধ জোয়ার থেকেই নয় ক্ষিপ্ত মৌমাছি থেকেও বাঁচালো। শনু দৌড়াতে দৌড়াতে এক মৌচাক থেকে আরেক মৌচাকের মধু খেতে থাকলো।

এমন সময় গভীর বন থেকে ভেসে এল এক শান্ত হিরণ্ময় কণ্ঠস্বর, ওহে বৎস! এখনো সময় হয়নি, মৌচাকের ভেতর এখন যে শিশু মৌমাছিরা আছে এতে তারা যে সব মারা যাবে। কিন্তু শনু কি সেই আবেদন, নিষেধ শুনেছিল? না। সে মধু খায় আর দৌড়ায়, আবার খায় আবার দৌড়ায়।

শনুর পাগলা ঘোড়া রে -কৈ মধু কৈ লইয়া যায়
উলু ডুলো নদী নালা গ্রাম বাড়ি পাহাড় পর্বত টিলা তালা চান বাড়ি
দারুণ ঘোড়া চলে ধিরে ধিরে-মাঝে মাঝে টক্কর লাইগা শুন্নে উড়া মারে
শনুর পাগলা ঘোড়া রে -কৈ মধু কৈ লইয়া যায়

এভাবেই যতক্ষণ না দেবী মৌমাছি তার সোনার মতো অথচ অত্যন্ত রাগীকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো... ওরে থাম, এক্ষুণি থাম, নইলে দক্ষিণ রায় এসে রক্ষা করবে আমার মৌচাক!

দক্ষিণ রায়! না বাবা, না!

বনবিবিগো!

তারপরে কিবা হইল গো ভাইরে- শুনতে যদি চান
সেই গল্প কইব আমার বন্ধু পাতলাচান

দেবী মৌমাছি তাঁর নাম উচ্চারণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধরণীর তলপেট চিরে গভীর কালো রক্তাক্ত এক গর্জন সারা ভূমিতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। সেই গর্জনের শব্দ সমুদ্রকে কাচের টুকরোর মতো চূর্ণ করে দিলো। ভীত জন্তু জানোয়ারকে স্তব্ধ করে দিলো। যে শনু দেবীমৌমাছির কথা প্রায় কানেই শোনেনি সেও এই মহা গর্জন পরিষ্কার শুনতে পেলো। তারপর আরো কিছু ভয়ঙ্কর শব্দ শুনতে পেলো; যে পদক্ষেপে পায়ের নিচের ভূমি কেঁপে উঠলো, নিঃশ্বাসে পাতারা উড়ে যেতে লাগলো। ঘূর্ণিঝড়ের গর্জনের মতো তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলো। শনু যে ডালে বসেছিল সেখান থেকে গিয়ে পড়লো এক পিঁপড়ার ঢিবির উপর।
আর যার নাম মুখে নিতে হয় না সেই দক্ষিণের সম্রাট, বনের রক্ষাকর্তা, দৈত্যরাজ দক্ষিণ রায় বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগলেন তাঁর প্রিয় ছদ্মবেশ রয়েলবেঙ্গল টাইগারের বেশে। যেন তার গা গোধূলি আকাশের লাল আলোর শিখা, তার উপর রাতের ঘন অন্ধকারের মত কালো ডোরাকাটা। তার চোখ ক্রোধে বিশাল এক মৃত্যুর মতো জ্বলে উঠলো। আর মুখ গুহার মতো খোলা আর প্রতিটা দাঁত যেন তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মতো।

রয়েলবেঙ্গল টাইগার দেখলে মানুষ সাধারণত এই পিঁপড়াদের মতো ভয়ে জমে যায়। কিন্তু শনু তাদের মতো না, সে দিলো এক ভোঁ দৌড়। সে এমন দৌড় দিলো যেন তার পায়ের তলায় ডানা আর পিঠে বসানো জেট ইঞ্জিন রয়েছে। দানববাঘের প্রতিটি পদক্ষেপে শনুর পেছনের জমি কাঁপতে থাকলো। সে জোরে আরো জোরে দৌড়াতে থাকলো যতোক্ষণ না সেই নৌকো দেখলো। কাঠুরিয়ারা নৌকা ছেড়ে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু যেই না সে কাদামাটি ছেড়ে সর্বশেষ লম্বা লাফ দিলো ওমনি তার পা সুন্দরীগাছের শিকড়ে গেল আটকে, আর সে হাত পা ছড়িয়ে ভীত হয়ে বনের মধ্যে পড়ে গেল। সে ঘাড়ে দক্ষিণ রায়ের উৎকট গরম শ্বাস টের পেলো এবং লোহার তারের মতো গোঁফ তার কানে বিঁধতে থাকলো। শনু দম ভরে বাতাস নিয়ে চিৎকার করে ওঠলো, বনবিবি! আমাকে বাঁচাও...সময় গেল থেমে...পৃথিবী নিশ্চল হলো...আকাশ হলো স্তব্ধ

আহা থামছো কেনা? থেমো না!

শনুর ঘাড়ের সেই উৎকট গরম শ্বাস উবে গিয়ে সেখানে একটি শান্ত সুগন্ধ, জেসমিন ও পদ্মের মতো যার সঙ্গে দারুচিনি ও গোলমরিচ মিশানো এমন এক ঘ্রাণ এলো । সেই ঘ্রাণ যদিও এক অদ্ভুত এক ধরনের মিশ্রণ কিন্তু তা শুকনো রক্ত ও ঘৃণার চেয়ে ঢের ভালো। তারপর এমন একটি স্বর যা আম্মার মতো কিন্তু তারচেয়ে অনেক প্রবীণ ও শক্তিশালী দারুণ এক কণ্ঠ ধমকে বলে ওঠলো, যথেষ্ট হয়েছে দক্ষিণ রায়! বাচ্চাদের গিলে খেলে তাতে কোনো সমাধান হয় না। এটা এতোদিনে তোমার জানা উচিত ছিল। শনু উঠো, বাবু, এখানে আসো। শনু একটুও না নড়ে সতর্কতার সঙ্গে আগে বাম ও পরে তার ডান চোখ খুলে দেখতে চাইলো তার মাথাটা দক্ষিণ রায়ের মুখের ভেতরে কিনা! ডান চোখে সে নদী, কয়েকটি সারস ও ঝিলমিলে সবুজ শাড়ির নিচে একজোড়া খালি পা দেখলো। কাদা থেকে মাথা উঠিয়ে সে দেখলো রুপার ত্রিশূল হাতে শ্যামলবরণ এক নারী।

এবারে সে তার বামচোখ খুললো, এবারে সে দেখলো সুন্দরীগাছ, গুঞ্জনরত মৌমাছি। তারপর কাছে দেখে এক লাল সালোয়ার কামিজ ও পার্শি জুতা পরা লম্বাচুলে ঘোমটা দেয়া আরেকজন নারী যোদ্ধা দাঁড়ানো। ইয়া আল্লা! আরেকজন? কতগুলো বনবিবি? সে ভাবলো। চোখের পাতা ফেলে উঠে দাঁড়াতে দুই বনবিবিকে এক হয়ে যেতে দেখলো। বনবিবির পেছনে তখনো দক্ষিণ রায়, রাগে গরগর করে ডোরাকাটা আগুনে লেজ ঝুলাচ্ছে। বনবিবিকে শনুর উপর ঝুঁকে তার মুখ ও হাত মুছিয়ে দিতে দেখে দক্ষিণ রায় ভীষণ জোরে গর্জন করে উঠলো, 'এই ছোকরা আমার, বনবিবি। সে বনের নিয়ম ভেঙেছে! এখন তাকে তার দাম দিতে হবে। তুমিই প্রতিজ্ঞা করেছো সব আক্রমণকারীই আমার হবে। আমি তার মাথা গুড়িয়ে দেবো, চিবিয়ে রক্ত চুষে খাবো।'

কিন্তু সে তাকে খায়নি তাই না? বনবিবিতো তাঁর অনেক চেয়ে শক্তিশালী না?

হ্যাঁ কিন্তু, বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের একটা চুক্তি ছিল তুমিতো জানো, বনের যে ক্ষতি করবে তাকে সে রক্ষা করবে না। ও হ্যাঁ সে অনেক দিক থেকে তার চেয়ে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এবার সে ওর সঙ্গে যুদ্ধ না করে কথা বললো। বনবিবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, দক্ষিণ রায়, তোমাকে না বললাম সে মাত্র একটা ছোট বাচ্চা। দক্ষিণ রায় আরো জোরে আরো ভয়ঙ্কর ভাবে গর্জে উঠলো, মৌমাছিদের যে বাড়িগুলো সে ধ্বংস করেছে তারাওতো বাচ্চা, বনবিবি! এ লোভী, ঠিক বড় মানুষরা যেমন হয় সে রকম। আমি তার মাথা গুড়িয়ে দেব, চিবিয়ে রক্ত চুষে খাবো! বনবিবি উত্তর দিলেন, সে ক্ষুধার্ত ছিল, লোভী না। সে অনেক সপ্তাহ ধরে অভুক্ত ছিল। তুমি অন্যায় করো না। তুমিওতো ভূখা থাকলে ভালো ব্যবহার করো না।

কিন্তু দক্ষিণ রায় রাগের চোটে কিছু না শুনেই বললো, এটা এদের দোষ যার জন্য আমরা সবাই না খেয়ে থাকি। এই বাজে মানুষরাই উপকূলের সব গাছ কেটে ফেলেছে। তারা মৌমাছিদের নিধন করেছে। মাছের চারাদের মেরে ফেলেছে। সে জন্যই এখানে ফল নেই! সে জন্যেই নদী আজ মাছ শূন্য! আমি তার মাথা গুড়িয়ে দেবো, চিবিয়ে রক্ত চুষে খাবো। একথা শুনে শনুর হৃদয় গভীর দুঃখে ডুবে যেতে লাগলো যেনো গভীর পানির নিচে শিকড় ঢুকে যাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় যেভাবে ওদের বাড়ি ভেঙে ফেলেছিল সে সেভাবেই উদোমাদা ভাবে সব মৌমাছিদের চাক নষ্ট করেছে– এ কথা মনে হতে তার মাথা লজ্জায় নুয়ে গেল। সে জন্য তাকে খাওয়াই উচিত সে ভাবলো– যদিও তার একান্ত ইচ্ছা তাকে যেন না খায়।

বনবিবি কঠোর ভঙ্গিতে সেই রাক্ষুসে বাঘের কাছে অধিপতির মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, আমরা সবাই ভুক্তভোগী দক্ষিণ রায়, জন্তু-জানোয়ার, গাছ-গাছালি এমনকি মানুষও। এই বাচ্চাকে মেরে ফেললে তোমার পুরনো সময় বা জঙ্গল ফিরে আসবে না। কিন্তু যদি সে তার ভুলের মাশুল দেয় তবে সুন্দরবন, মৌমাছি, তার এবং তোমার কিছু পাওয়ার আশা থাকবে।

ভয়াতুর শনু, 'ক্ষ...ক্ষমা ক করো, ব-বনবিবি, দক্ষিণ- ন রায়...' বলে বলে উঠলো, যেন তার জিহ্বা আটকে গেছে। 'আ- আমি সত্যি সত্যি অনেক দুঃখিত যে আমি মৌচাক ভেঙেছি আর তৈরি হবার আগে মধু চুরি করেছি। আমার ভীষণ ভুল হয়েছে আর আমি বুঝতে পারছি কেনো দক্ষিণ রায় আমাকে মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু এ ব্যাপারে যদি কোনো উপায় থাকে সত্যি বলছি আমি তা করতে চাই।' বনবিবি মৃদু হাসলেন আর শনুর মনে হলো যে বরফের দলাগুলো তার গলায় আটকে ছিল তা গলে যাচ্ছে। 'হ্যাঁ শনু আছে। তুমি এমন মৌমাছিদের এমন কিছু কেড়ে নিয়েছো যা তাদের দেবার সময় হয়নি, যা তাদের এখন দরকার। তোমাকে তার প্রতিকার করতে হবেই; তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে মৌমাছিদের মৌচাক বাঁচাতে হবে। কিন্তু এটা সহজ নয়, আর এটি সময় সাপেক্ষ। তোমাকে বৃষ্টি, বাতাস ও ঠা ঠা রোদে মাসের পর মাস ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং গ্রীষ্ম পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তোমাকে তোমার পরিবার থেকে দূরে থাকতে হবে। এটা কি করতে পারবে?'

দক্ষিণ রায় গর্জন করে ক্রুদ্ধভাবে তাকালো, 'কিন্তু সে যা করেছে তার জন্য মরা উচিত! এখনই তার বিচার হবে! আমি তার মাথা গুড়িয়ে দেবো, চিবিয়ে রক্ত চুষে খাবো ...।' 'দক্ষিণ রায়! এইভাবে এটা নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করলে আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাবো। তার মাথা গুঁড়ো করলে আর রক্ত চুষে খেলে কি মৌমাছিরা বাঁচবে? যদি তুমি তাদের সত্যি সাহায্য করতে চাও তবে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখো!' দক্ষিণ রায় গোঁ গোঁ করতে করতে ক্ষুব্ধ মনে চুপ মেরে গেল।

শনুর মনে হলো, যে কোনো কিছুই ঐ রাক্ষুসে বাঘের গরম উৎকট শ্বাস-প্রশ্বাস ও ভয়ঙ্কর ছুরিরমতো দাঁতের নিচে পড়ার চাইতে ভালো। তাই সে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বনবিবিকে মৌমাছিদের ভূবনে অনুসরণ করলো। বনবিবি শনুকে সেখানে এক খোলা জায়গায়, মৌচাকগুলোর মাঝে, দুহাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। আর বর্ষা এলে পর তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা করলেন। তারপর বনবিবি তার পা ও কপালে রুপার ত্রিশূল ছুঁইয়ে দিলেন এবং নিচু হয়ে মাটিতে ফিস ফিসিয়ে কথা বললেন।

শনু দেখলো কাদা মাখা বিরাট একটা লতা ক্রমশ তার শরীর ঘিরে দ্রুত বেয়ে উঠতে লাগলো। তাতে সে শেষ পর্যন্ত একটি খয়েরিসবুজ বর্ণের কেলিওডোসকোপ হয়ে গেল। তার দুখানা পা পানির অন্বেষায় মাটি ছিদ্র করে চারিদিকের নুড়ি সরিয়ে পাথরের গা পেঁচিয়ে ভেতরে ঢুকতে থাকলো আর তাতে কোঁকড়া শিকড় গজিয়ে যেতে থাকলো।

একটু কাতুকুতু লাগলো। তার পা দুটো একত্রে মিশে কাণ্ডে পরিণত হলো এবং বেশ ভারি হয়ে গেল। তারপর তার বুক মাথা ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেল এবং যাবার সময় নির্বিঘ্নে তার সরু কাঠের পেটকে ঘিরে বাকলে ঢাকা দিয়ে দিলো। আর বনবিবি তার যে হাতগুলো আকাশে ছড়িয়ে দিতে বলেছিল তারা ডাল থেকে ডজন ডজন শাখা প্রশাখা হয়ে গেল। আর তার পরে সেখানে দাঁতের মতো প্রান্তওয়ালা চোখের আকৃতির পাতা গজালো। প্রতিটি শাখা এবং পল্লব শেষে একটি প্রদীপ্ত সূর্যের মতো ঘণ্টা আকারের ফুল ফুটে উঠলো। সে পাঁচ পাপড়ি ঘণ্টাফুল সকালে সোনালি, দুপুরে কমলা আর রাত্রিতে লাল হয়ে ম্লান হয়ে মরে যায়।

জবা ফুল মৌমাছিরা খুব ভালোবাসে। তাই শনু একটি জাদু-জবাফুল গাছ হয়ে গেল যাতে মৌমাছিরা প্রতিদিন সারাক্ষণ তার ফুলের রস নিয়ে মধু তৈরি করতে পারে। যাতে তারা মৌচাক আবার তৈরি করতে পারে, বাচ্চাদের বড় করতে পারে। সে কি হঠকারিভাবেই না মধু লুট করে খেয়ে ছিল। কিন্তু সে বৃষ্টিহীন শুকনো ভ্যাপসা গরমকালে দিনের পর দিন ফুল ফোটানো কঠিন ছিল; ভীষণ কঠিন কাজ। সে জন্য শনুর শিকড়-পাগুলো সূর্যের উত্তাপের মধ্যে পানি শুষবার জন্য কেবলই মাটির গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করছিল; সরু কাণ্ড তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই পানি গাছের শাখায় ও জ্বলন্ত সবুজ পাতায় ঠেলে দিতে দিচ্ছিল। শুধু ফুল ফোটার জন্য। কখনো মনে হয়েছে যেন ভূমি নড়ে উঠছে বা কারো গলার গরগর শব্দ শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু সে রাক্ষুসে বাঘ তার সামনে আসেনি। ক্লান্ত অবসন্ন শনু দিনের শেষে একটু পাগুলো তুলে বিশ্রামও নিতে পারছিল না। শুধু পাতাগুলো গুটিয়ে, ফুলগুলো ভাঁজ করে ঐ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিল।

আহারে শনুরে!
কিন্তু তার সে কষ্ট সার্থক হয়েছিল। যে মৌমাছিরা প্রথমে তার উপর ক্ষুব্ধ ও তার সম্পর্কে সন্দেহ প্রবণ ছিল তারাই তাদের বাড়ি মেরামত করে নতুনভাবে তৈরির পর সেই বাড়িতে যখন তাদের বাচ্চারা ক্রমশ বড় হয়ে শক্তপোক্ত হতে থাকলো, তাই দেখে খুশি হতে লাগলো। তারা ঘরে ফেরার পথে শনুকে গল্প বলতে থাকলো সারারাত। সেই গল্পগুলো তাদের দেখা অদ্ভুত সব ঘটনার গল্প বা সেই সব গল্প যা তারা তাদের মায়ের কাছে শুনেছে। তারা শনুকে গান শোনাতো, শনু সে গান

তার ডালে ডালে পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনিত করতে শিখলো ।

তারপর একদিন হাওয়া এতো শুকনো হলো যে জোয়ারের ঢেউয়ের মতো তার তাপ বেড়ে গেল । ক্ষুধা তৃষ্ণায় শনু খটখটে হয়ে বাঁকা হয়ে গেল । তার ফুলগুলো চুপসে গেল, ফুলের রং হলো শুকনো রক্তের মতো । পাতারা ঝলসে ফেটে ধূসর হয়ে যেতে লাগলো । শিকড় ফেটে গেল । কাণ্ডের বাকল থেকে খোসা ঝরে যেতে লাগলো । আর তাতে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে তার চোখজোড়া আর খুলে রাখতে পারছিল না । তার সব ভাবনা এলোমেলো হয়ে গুলিয়ে যাচ্ছিল । তারপর হঠাৎ, একদিন সেই বদরাগী অপমানিত দক্ষিণ রায় এসে সেখানে দাঁড়ালো । কাছে আসতেই এই বাচ্চা-বালক-গাছের মনে স্রোতের মতো প্রশ্ন জেগে উঠতে লাগলো; মাগো, এই রাক্ষুসেটা আবার গাছ খায় নাতো?
আমার ডাল ভাঙলে ব্যথা পাবো নাতো?
সে আমার গায়ে কামড়াবে নাতো?
যদি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়?
সে তো এসব অনায়সেই করতে পারে, পারে না?
কিন্তু সে না বনবিবির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে?
দক্ষিণ রায় সোজা এসে ঠিক শনুর সামনে দাঁড়ালো । তার দিকে একটু তাকিয়েই গা ঝাঁকা দিলো ।
তারপর ঝাঁকাতেই থাকলো, ঝাঁকাতেই থাকলো আর ঝাঁকাতেই থাকলো । সেই অন্তহীন কম্পনে আট জোয়ারের তিন নদী থেকে তাজা নিরাময়ী পানি বৃষ্টির মতো উথলে উঠে শনুকে ভিজিয়ে দিলো: তার কলি, ফুল, পাতা, বাকল, শিকড়-বাকড় সব । সেই পানি মাটি ভিজিয়ে গড়াতে গড়াতে পাতালে প্রবেশ করে যেতে যেতে একেবারে শনুর শিকড়ের শেষ অবধি পৌঁছালো ।
অদূরে- গভীর বনে বনবিবির মুখে মৃদু হাসি জেগে উঠলো ।

গান

এই পর্যন্ত ইতি হইল মধু শিকারির পালা-সবার কাছে এই মিনতি গো–জানাইলাম আসরে
হায় গো আমার বিষয় না বুঝিয়া-জীবনে কি করলাম আমি গো
বনের সবাই বনে থাকুক আনন্দে মাতিয়া-তোমরা কেহ ধ্বংস কইরো না- থাকল মিনতি
হায় গো আমার বিষয় না বুঝিয়া-জীবনে কি করলাম আমি গো
সুন্দরবন সুন্দর থাকুক অপরূপ রইয়া-সবাই মিলে তারে বাচাব ভাইরে- এসো করি পন
হায় গো আমার বিষয় না বুঝিয়া-জীবনে কি করলাম আমি গো
ভুলত্রুটি হইলে আমায় মাপ করবেন গুরুজনে-আজকের মত গল্প বলা শেষ - জানাইলাম আসরে
হায় গো আমার বিষয় না বুঝিয়া- জীবনে কি করলাম আমি গো ।

(চলবে)

বীথি ঘোষ: শিক্ষক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মী
ইমেইল: bithiighoshh@gmail.com

মহেশখালীতে উন্নয়নের মহাযজ্ঞ

সূত্র : প্রথম আলো, ১৬ জুলাই ২০১৯